বিশ্ব থেকে মহাবিশ্বের চরাচরে কতই না বিস্ময় লুকিয়ে আছে! কিছু আমাদের কাছে জ্ঞাত, আর বাকিটা এখনও অজ্ঞাত। যতই জানি, জানার অন্ত হয় না। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির যে রহস্য একসময় অজানা ছিল। সেই ১৩৭০ কোটি বছর আগে বিগ ব্যাং-র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি এবং ৬০ কোটি বছর আগের নক্ষত্রপুঞ্জের সমাহারের ছবি আজ দৃশ্যমান। না জানি আরও কত রহস্য লুকিয়ে আছে আলোকবর্ষের অন্তরালে...

গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৪, সংখ্যা ২
জুলাই ২০২২

রহস্য-রোমাঞ্চ ও কল্পকাহিনী সংখ্যা

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী, শুভ্র নাগ, দোলা ভট্টাচার্য, অনাবিল তসনিম, গোবিন্দ মোদক এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

@Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

সাহিত্য গড়ে ওঠে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে। প্রতিটি বিষয়ের মধ্যেই থাকে একটা আলাদা গুরুত্ব। 'গুঞ্জন' সেই বিষয়গুলিকে তুলে ধরতে সদাই তৎপর। রহস্যময় গল্প পড়তে এক বিপুল সংখ্যক পাঠক উৎসাহী। রহস্য জড়িয়ে থাকে আমাদের প্রতিদিনের বাহ্যিক জীবন ও জগতের সাথে। একজন সাতিহ্যিক সেই রহস্যকে মননশীল ভাবনা ও নব আঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলেন আপন কলমের কৃতিত্বে।

পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে যে, এই রহস্য কাহিনী কি কি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এর উত্তরে বলা যায়, গুপ্তধন রহস্য, হত্যা রহস্য, অন্ধ কুসংস্কার ও ভৌতিক রহস্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে রহস্যের আঁতুড়ঘর।

তবে রহস্য রোমাঞ্চের সাথে যদি যুক্ত হয় কল্পকাহিনীর গল্প, তাহলে পাঠক পায় ভিন্ন স্বাদের আস্বাদন। তাই আপনাদের প্রিয় 'গুঞ্জন' ই–পত্রিকাটির জুলাই সংখ্যাকে 'রহস্য রোমাঞ্চ ও কল্পকাহিনী' দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। তার পাশাপাশি ধারাবাহিক কাহিনীও আছে। আমরা আশা রাখি, এই সংখ্যাটি পাঠকদের খুবই পছন্দ হবে। আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমাদের দপ্তরের ই-মেলে প্রেরণ করবেন ও পত্রিকাটির সম্পূর্ণ লিঙ্কটি শেয়ার করবেন। ■

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন
বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

কলম হাতে

আজ তবে পয়লা আষাঢ়

শুভ্র নাগ

দিনান্তের আকাশেতে কৃষ্ণ মেঘরাজি
দেখি অনিমেষ নেত্রে। প্রতিপদী চাঁদ
পুষ্যা অভিজিত সহ মেঘাবৃত আজ।
জ্যৈষ্ঠ দহনে বসুধা চাতকের ন্যায়
আকুলিত বারিপ্রার্থী। সন্ধ্যা নামে ধীরে।
শান্ত গ্রাম, শীর্ণ নদী, প্রাচীন মন্দির –
সুমনন, সুচিন্তনে ধনী গ্রামবাসী–
শিল্পীর তুলিতে আঁকা এক চিত্রপট
যেন – অপূর্ব সুন্দর। আটচালা তলে
কথক ঠাকুর পড়ে মহাভারতের
কথা। যেথা মহারাজ শান্তনু প্রার্থনা
করেন পাণি মা গঙ্গার। সুন্দর কথনে
তার ফুটে ওঠে ছবি দৃষ্টির সম্মুখে-
মনে হয় ইনি বুঝি সারথী সঞ্জয়
এই যুগে এই কালে। অন্যদিকে দেখি
বিশ্বনাথ মন্দিরেতে সৌম্য ভক্তকুল
সন্ধ্যারতি কালে বসি শিবাশিস মাগে।
অনুপম গর্ভগৃহে অনির্বাণ শিখা

জ্বলে সুদীপ্ত প্রদীপে। ইন্দ্রনীল দ্যুতি
বিচ্ছুরিত শিব অঙ্গে। তরুণ পুজারী
দীপঙ্কর ধ্যানমগ্ন। হেনকালে দেখি
বিজুলি ঝলসি ওঠে, অমিত আলোতে
আলোকিত চরাচর। ক্ষণিকের পরে
ডমরু উঠিছে বাজি পিনাকীর হাতে
মেঘমন্দ্র মেঘনাদ। পৃথিবী উঠিল
কাঁপি থরথর করি প্রবল নিনাদে
যেন বিভীষণ রণ। পুরাকালে বুঝি
এইভাবে একদিন মেঘ অন্তর্পট হতে
মেঘনাদস্বনে যুদ্ধ করি মেঘনাদ
জয়ন্ত - ইন্দ্ররে জিনি লভেছিল নাম
ইন্দ্রজিত। জলভারে নত তোয়ধর
ঢালিছে অমৃতবারি দানিছে পৃথ্বীরে
তার সঞ্জীবনী মন্ত্র- তৃষ্ণার্ত ধরণী
আত্মীভূত করে চলে অসীম তৃপ্তিতে
অনন্ত এ বারিধারা। স্নিগ্ধ পবমান
আশ্বাস দিতেছে আনি সকল প্রাণীরে।
আবার সবুজ হবে এই ধরাতল।

নববর্ষা আমন্ত্রিত – তার গান শুনি
গৃহস্থ কুটিরে যেথা সুমন গায়ক
মেঘমল্লারের রাগে বাঁধে গান তার।

মনহরা

স্বপ্নসম চিত্রকল্প – ভেসে যাই আমি
অনন্ত আনন্দ স্রোতে স্বপ্নের ভেলায়।
বৃষ্টি থামে। ছেঁড়া মেঘ, টুকরো চাঁদের
আলো, উচাটন মন। দৃষ্টিভ্রমে দেখি
বিরহী যক্ষের বার্তা নিয়ে একটুকু
শুভ্র মেঘ টানে দাঁড় আকাশগঙ্গায়
মনে পড়ে আজ তবে পয়লা আষাঢ়। ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ মাঝি...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১২ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

শিব দুহিতা নর্মদা

ষষ্ঠ পর্যায় (৫)

ডাঃ অমিত চৌধুরী

সকাল পাঁচটা। আজ ২৭শে এপ্রিল। রাস্তায় নেমে পড়েছি। ঠিক রাস্তা নয় নদীর চড়। যেহেতু ভোর বেলা, হাঁটতে ভালোই লাগছে। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর গ্রামের ভেতরের রাস্তার পথ ধরলাম। কিন্তু এটা রাস্তা না বলাই ভালো। কোনো ভাবেই হাঁটা যাচ্ছে না। পায়ের তলায় সূঁচের মতো পাথর ফুঁটছে। মাথার উপরে সূর্যের তাপ। কষ্টটা সহজেই অনুমেয়। এই ভাবে দুপুর সাড়ে বারোটার সময় একে একে গুয়েট, সূর্যানা, মনোহরপুর, ভ্রামরি, পেরিয়ে এলাম হান্ডিয়াত। এবারের মতো সমাপ্তি এখানেই করব।

আমরা আছি দক্ষিণ পাড়ে। এখানে মহাদেব ঋদ্ধিনাথ আছেন। ইনি বৈষ্ণব শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের গায়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ছাপ স্পষ্ট। উত্তর তটের নাম নেমাবার। নেমাবারে আছেন সিদ্ধিনাথ। এই জায়গাটিকে বলা হয়, নর্মদার নাভিকুণ্ড। অর্থাৎ নর্মদা পরিক্রমার চারভাগের একভাগ পথ এই পর্যন্ত এলে অতিক্রম করা হয়।

এই হান্ডিয়াতেই কুবের শিবের তপস্যা করে ধনাধিপতি হয়েছিলেন। রাবণ তার বৈমাত্রেয় ভাই কুবেরকে লঙ্কা থেকে

বিতাড়িত করে সমস্ত কিছু কেড়ে নেন। পরে কুবের শিবকে সন্তুষ্ট করে লঙ্কাপুরী ছাড়া অলকাপুরীসহ সবই ফিরে পেয়ে ছিলেন। সেই জন্য এখানকার শিবের নাম ঋদ্ধিনাথ। এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ব্যাসজী আমাদের একটি বিশেষ মন্ত্রে ঋদ্ধিনাথের পুজো করালেন। যেহেতু শিবলিঙ্গের গায়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অঙ্কিত আছে তাই মন্ত্রটিও শিব এবং বিষ্ণুকে একসঙ্গে স্মরণ আর প্রণাম করার মন্ত্র।

এখনো বহু দূর বাকি। কবে শেষ হবে জানি না, আদৌ হবে কিনা তাও জানি না। আমরা শুরু করেছিলাম অমরকণ্টক থেকে। একে একে পেড়িয়ে এলাম অনেকগুলি জেলা। যেমন অনুপপুর, দিনডরি, মাণ্ডলা, রাইসান সিউনি, জব্বলপুর, নরসিমাপুর, হোসেঙ্গাবাদ এবং হারদা — এই নয়টি জেলা।

নর্মদা পাড়েই একটি আশ্রমে থাকার জায়গা পেয়ে গেলাম। দর্শন পেলাম রামজী মহারাজের মতো এক মহাত্মার। উনি পঞ্চতপা করছেন। শিবকে পাওয়ার জন্য পার্বতী এই তপস্যা করেছিলেন। চারদিকে আগুন এবং মাথার উপর সূর্যদেব। এই পাঁচটি তাপ সহ্য করাকেই বলে পঞ্চতপা। ধন্য ভারতীয় সাধককুল। ধন্য ভারতীয় শিক্ষা। ত্যাগের মাধ্যমে যেটা পাওয়া যায় সেটাই চিরস্থায়ী। এই সাধুদের সাথে যদি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত তাহলে ধন্য হয়ে যেতাম। সেটা কি সম্ভব? জানি না। সময় তার উত্তর দেবে। খবর পেলাম আমার বিশেষ এক পরিচিত

জনের ক্যান্সার হয়েছে। পোস্টমাস্টার মশাই তপন বিশ্বাসের ক্যান্সার রোগের থেকে আরোগ্যের জন্য মহারাজকে নর্মদা মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করলাম। মহারাজ রাজী হয়ে বললেন আজই হবন করব এবং যথাসময়ে আমরা যজ্ঞে অংশগ্রহণ করলাম।

আমরা কি ভাবে পরিক্রমা করছি, কোথা থেকে শুরু করেছি সব কিছু রামজী মহারাজ জানতে চাইলেন। আমি বিস্তারিত বললাম। আমরা খণ্ড পরিক্রমা করছি বলে অনেকেই বিদ্রুপ করছে শুনে উনি হেসে উঠলেন। উনি বললেন দেখো মায়ের কাছে তার সন্তান আসবে, তা সে কিভাবে আসবে সেটা আসল বিষয় নয়। মায়ের আসন সন্তানের অন্তরে পাতা আছে কিনা সেটাই হলো আসল কথা। তাই বিদ্রুপ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ঐ সব কথায় কান দিও না, মন খারাপ করো না। মা না চাইলে তুমি বার বার কেন, একবারও আসতে পারতে না। জেনে রাখো তোমাদের এই খণ্ড পরিক্রমায় মায়ের সমর্থন আছে। তা তো তুমি বারবার বুঝতেই পারছো। বলে হাসি মুখে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে আমার দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে যাও চিন্তার কোনো কারণ নেই।

এই মহাত্মাকে বিদায় দিয়ে আমাদের কলকাতায় ফিরে আসতে হল। কিন্তু যদি এনার কাছে সারাজীবন থেকে যেতে পারতাম তাহলে জন্ম সার্থক হত। আবার অপেক্ষার পালা...

“নর্মদে হর”

...ষষ্ঠ পর্ব সমাপ্ত ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **‘গুঞ্জন’এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

রুমাল

(অন্তিম পর্ব)

অনাবিল তসনিম (বাংলাদেশ)

রমিজ খানের বাড়িটি বেশ সুন্দর। তাঁর নিজের বাড়ি। টিনের দোতলা বাড়ি। বাড়িটির সামনে বড় একটি খোলা মাঠ আছে। মাঠের মাঝখানে বড় একটি আমগাছ। এক পাশে রয়েছে প্রকাণ্ড একটি শিরীষ গাছ। কিছু সুপারি গাছও আছে পাশাপাশি। বেশ সুন্দর পরিবেশ।

রমিজ খানের এই বাড়িতে আনিস ছয়দিন থাকল। বাড়িতে রমিজ খান আর তাঁর মেয়ে থাকেন। সকালবেলা একজন ঝি এসে বাড়িঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। এই ছয়দিনে রমিজ সাহেবের মেয়ের সম্পর্কে সে আরো যা জানলো তা হলো — মেয়েটির নাম দীবা। পুরো নাম:- উম্মে হাবিবা সুলতানা দীবা। এবার অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছে। চেহারাও মোটামুটি সুন্দর। মোটমুটি বললে ভুল হবে, বলা উচিত — 'বেশ সুন্দর'। গায়ের রঙ হালকা শ্যামলা। শ্যামলা হলেও চেহারায় আলাদা এক ধরনের মায়া আছে। অত্যন্ত মিষ্টভাষী মেয়ে। তার দিকে একবার তাকালে চোখ ফেরানো মুশকিল। আচার-ব্যবহারও অত্যন্ত বিনয়ী। এ বাড়িতে আসার

পর থেকেই দীবার অতিথি আপ্যায়নে আনিস মুগ্ধ। মেয়েটির চোখদুটোও অসম্ভব সুন্দর। সম্ভবত এই মেয়ের মতোই কোনো এক মেয়ের চোখজোড়া দেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস —
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।"

এখন মধ্যরাত। আনিসের ঘুম আসছে না। সে দরজা খুলে বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়ালো। জোছনা রাত। জোছনার আলো পড়েছে পুরো মাঠ ও উঠোনজুড়ে। হালকা বাতাস বইছে। বেশ শীত পড়েছে এবছর। কনকনে শীত। চারদিকে গাঢ় কুয়াশা। এসময় শহরে এতো শীত পড়ে না। কিন্তু গ্রামে দারুণ শীত পড়ে।

ঘটনা কোনদিকে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। আজ বৃহস্পতিবার, আগামীকালই বিয়ে। আগামীকাল যদি সত্যি সত্যি বিয়েটা হয়ে যায়, তাহলে বিরাট ঝামেলা হবে। এই মুহূর্তে বিয়ে করা যাবে না। তাছাড়া হঠাৎ বিয়ে করে বাসায় বউ নিয়ে গেলে ব্যাপারটা পরিবারের সবাই মেনে নেবে কি না সন্দেহ আছে। সে মনে মনে ঠিক করল, কালকে ভোরেই এখান থেকে পালাতে হবে। এখান থেকে পালাতে না পারলে এরা জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবে।

শুক্রবার। ভোর ছয়টা।

আকাশে মেঘ জমেছে। ঘন কালো মেঘ। যে কোনো মুহূর্তে

প্রাপ্তি

ঝমঝম করে বৃষ্টি নামবে। এখন বৃষ্টির সময় না। কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। এখন বৃষ্টি শুরু হলে তো আনিস বিপদে পড়ে যাবে। তার সঙ্গে ছাতা নেই। বৃষ্টি শুরু হলে, না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাই দেরি না করে এখনি বেরিয়ে পড়া উচিত।

রমিজ খানের বাড়ি থেকে বের হবার আগে দীবা বলল, "আপনি আবার কবে আসবেন?"

আনিস বলল, "এই মুহূর্তে সঠিক বলতে পারছি না। কেন বলুন তো?"

দীবা বলল, "আপনার সাথে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে। এই তথ্য কি জানেন?"

"জি জানি।"

"আপনি কি বিয়েতে রাজি?"

আনিস জবাব দিলো না। দীবা আবার বলল, "আপনি কি বিয়েতে রাজি না? বিয়েটা না করে চলে যাচ্ছেন কেন?"

আনিস বলল, "আমার একটা জরুরি কাজ আছে। আমি আগামী সপ্তাহে আবার আসব। তখন আপনাকে বিয়ে করব।"

দীবা শান্ত স্বরে বলল, "আমি আপনাকে একটা জিনিস উপহার দেবো।"

"জিনিসটা কী?"

দীবা অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে ড্রয়ার থেকে একটা রুমাল বের করল। রুমালটা একটা ব্যাগে ভাঁজ করে রাখলো অত্যন্ত যত্নে।

প্রাপ্তি

"এটা নিন।"

"কী এটা?"

"একটা রুমাল।"

"আমাকে রুমাল দিচ্ছেন কেন? আমি রুমাল দিয়ে কী করবো?"

"আপনি যে আমাকে বিয়ে করবেন না সেটা আমি জানি।"

আনিস হতভম্ব গলায় বলল, "কীভাবে জানেন?"

"আমি জানি। আমার চেহারা শ্যামলা। তাই হয়তো আপনার আমাকে পছন্দ হয়নি।"

"আপনার কী আমাকে পছন্দ হয়েছে?"

দীবা সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, "আপনার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে, আপনি এই বিয়েতে রাজি না। আর বিয়ে করবেন না কারণেই তো এতো সকালে উঠে পালিয়ে যাচ্ছেন। এই রুমালটা রাখুন। অন্তত আমার একটা স্মৃতিচিহ্ন আপনার কাছে থাকুক।"

আনিস রুমালটি হাতে নিল। সে এখন অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে রুমালটিকে উল্টে-পাল্টে দেখছে। গাঢ় বাদামি রঙের রেশমি কাপড়ের রুমাল। সারা গায়ে ছোট ছোট বলের মতো নকশা করা। কারুকাজটা অসম্ভব সুন্দর।

দীবা বলল, "উপহারটা কি পছন্দ হয়েছে আপনার?"

আনিস চাপা গলায় বলল, "হ্যাঁ, খুব পছন্দ হয়েছে।"

আনিস যা ভেবেছিল, তাই হচ্ছে। সত্যি সত্যিই বৃষ্টি পড়া

শুরু করেছে। তবে ঝুম বৃষ্টি না, হালকা বৃষ্টি। একটা ভরসা আছে, এই বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকবে না।

দূরের কোনো এক মসজিদ থেকে আজান শোনা যাচ্ছে। আনিস ওজু করে ফজরের নামাজ পড়ল। নামাজ শেষ করে সে রমিজের বাড়ি থেকে বেরুনোর প্রস্তুতি নিল। রমিজ সাহেব তখনো ঘুম থেকে ওঠেননি। বেরুবার আগে দীবা হাসি মুখে বলল, “সকালের নাস্তাটা করে যান। এতো দূর জার্নি করে যাবেন, রাস্তায় ক্ষুধা লাগতে পারে। নাস্তা রেডি। আপনি বসুন। আমি এক্ষুণি নাস্তা নিয়ে আসছি।”

আনিস ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নাস্তা শেষ করার পর দীবা চা নিয়ে এল। দীবা চায়ের কাপ আনিসের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললো, “এই নিন চা। সবাই বলে — আমি নাকি খুব ভালো চা বানাতে পারি। আপনি খেয়ে দেখুন কেমন হয়েছে। চা তো আপনার খুব পছন্দ।

আনিস দীবার দিকে আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে ‘চা’ খেতে পছন্দ করে, এটা দীবা জানলো কীভাবে? এটা তো তার জানার কথা না। আনিস-ই কী দীবাকে কথা প্রসঙ্গে কখনো একথা বলেছে? মনে তো হয় না।

দীবা বলল, “কী হলো? এভাবে তাকিয়ে কী দেখছেন? চা টা নিন। চা তো ঠান্ডা হয়ে যাবে।”

আনিস বলল, “আপনি কীভাবে জানেন যে চা আমার পছন্দ?”

দীবা বলল, “আপনার ওই কালো ডায়েরিটা পড়ে জেনেছি।

প্রাপ্তি

গত পরশু দিন আপনি যখন বাবার সাথে বাইরে বেরিয়েছিলেন, তখন আপনার ডায়েরিটা বিছানার ওপরে রাখা ছিল। আমি কৌতূহলবশত ডায়েরিটা খুললাম। ডায়েরির প্রথম পৃষ্ঠাতেই আপনার পছন্দের খাবার ও পছন্দের বিভিন্ন বিষয় লেখা ছিল।

"আপনি কী ডায়েরির প্রথম পৃষ্ঠাটা পুরোটাই পড়েছেন?"

"জি। আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। আমার মুখস্থবিদ্যা খুব ভালো। একবার পড়লেই আমার সব মনে থাকে।"

আনিস চা'য়ে চুমুক দিলো। দীবা আগ্রহী গলায় বলল, "আমি কী আপনার ডায়েরির প্রথম পৃষ্ঠাটি মুখস্থ পড়ে শোনাবো?"

আনিস জবাব দিলো না। সে চা'য়ে দ্বিতীয় চুমুক দিল। 'চা'-টা অসম্ভব ভাল হয়েছে। চা খাওয়ার সময় আনিস অন্য কোনোদিকে তাকায় না। অন্যদিকে মনোযোগ দিলে চায়ের আসল মজাটা টের পাওয়া যায় না।

দীবা বলল, "আপনি চা খান। আর আমি আপনার ডায়েরির প্রথম পৃষ্ঠাটা পড়ে শোনাই। পড়া শেষ হলে আপনি বলবেন — সব ঠিক বললাম কি না। বুঝতে পারছেন?"

আনিস এবারও কোনো জবাব দিলো না। সে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে চা খাচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে — বিশ্বের সবচেয়ে

সুস্বাদু পানীয় সে খাচ্ছে। আনিস দীবার একটাই দোষ লক্ষ্য করল, সে যখন কথা বলা শুরু করে তখন একটানা কথা বলে। বিরতিহীন ভাবে। দীবা ডায়েরির প্রথম পৃষ্ঠা মুখস্থ বলা শুরু করল। আনিস চুপচাপ চা'য়ে চুমুক দিতে দিতে তার কথা শুনতে লাগল। ডায়েরির প্রথম পাতায় লেখা—

প্রিয় ব্যক্তিত্ব: আমার আব্বা ও আম্মা।

প্রিয় রঙ: নীল, হলুদ, সাদা।

প্রিয় শখ: বই পড়া, গান শোনা ও বাগান করা।

প্রিয় বই: শেষ বিকেলের মেয়ে (জহির রায়হান), আমি তপু (মুহম্মদ জাফর ইকবাল), আরেক ফাল্গুন (জহির রায়হান), দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অব টম সয়ার (মার্ক টোয়েন), তুমিই (ইমদাদুল হক মিলন)।

প্রিয় লেখক: জহির রায়হান, ইমদাদুল হক মিলন, আসিফ নজরুল, স্যার আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, চার্লস ডিকেন্স, মার্ক টোয়েন।

প্রিয় খাবার: প্রিয় খাবার বলতে কিছু নেই। খাবারের প্রতি আমার তীব্র অনীহা রয়েছে। তবে পানীয়ের মধ্যে 'চা' আমি খুব পছন্দ করি। বিশেষ করে দুধ চা। কেউ আমাকে 'দুধ চা' অফার করলে আমি কখনো না বলি না। একবাক্যে রাজি হয়ে যাই।

দীবা একটানা মুখস্থ বলার পর আগ্রহী গলায় বলল, "সব মুখস্থ বললাম। বলেছিলাম না, আমার মুখস্থবিদ্যা ভালো, সব

সব ঠিকঠাক হয়েছে তো?”

“হয়েছে।” বেরোবার সময় আনিস দেখল, দীবা তার দিকে ছলছল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চোখভর্তি পানি। মনে হচ্ছে যেকোনো মুহূর্তে কেঁদে ফেলবে। আনিসের মন সামান্য খারাপ হলো। মেয়েটা কী সত্যি সত্যি তাকে পছন্দ করে ফেলেছে নাকি? সে কী আনিসকে বিয়ে করতে চায়? হতে পারে।

কিন্তু এই মুহূর্তে বিয়ে করা আনিসের পক্ষে সম্ভব না। দীবাকে যে আনিসের পছন্দ হয়নি — ব্যাপারটা তা না। তার খুব পছন্দ হয়েছে। পছন্দ হবে না-ই বা কেন? দীবাকে যে দেখবে, সে-ই পছন্দ করবে। পছন্দ করার মতো সব গুণই তার আছে। আচার-ব্যবহারও অত্যন্ত ভালো। সবসময় তার মুখ হাসি-হাসি থাকে। এ ধরনের মানুষরা ভালো মনের হয়। এরকম লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে হাতছাড়া করা ঠিক না।

কিন্তু এছাড়া আনিসের কোনো উপায়ও নেই। সে এখনো বেকার। ইতোমধ্যেই সে অনেকগুলো চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েছে। চাকরির জন্য অনেক চেষ্টা করছে। তাতে লাভ হচ্ছে না। রিটন ও ভাইভা পরীক্ষায় ভালো করলেও, শুধু টাকার অভাবে তার কোনো চাকরি হচ্ছে না। সবাই ঘুস চায়। দেশ চলছে ঘুসের ওপর। একমাত্র সরকারি বা বি.সি.এস. ক্যাডারের চাকরি ছাড়া আর কোনো চাকরিই ঘুস ছাড়া হয় না।

প্রাপ্তি

একবার এক মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে রিটন ও ভাইভা দিয়েছিলো সে। ফলাফলও খুব ভালো ছিল। রেজাল্ট দেখে আনিস নিশ্চিত ছিল, এই চাকরিটা তার হবেই। রেজাল্ট ভালো হয়েছে — এই খুশিতে সে দুই কেজি দই কিনে ফেলল। দই তার মা'র অত্যন্ত প্রিয়। দই কিনে বাড়ি ফিরল রিকশা দিয়ে।

আনিসকে দেখে তার মা (আলেয়া বেগম) বিস্মিত গলায় বললেন, "তোর হাতে এটা কিসের প্যাকেট?"

'দইয়ের।"

"হঠাৎ দই কিনতে গেলি কেন?"

"তেমন কোনো কারণ নেই। এমনি।"

"এমনি এমনি দই কিনলি কেন?"

"তুমি পছন্দ করো তো তাই। তাছাড়া আরেকটা কারণ আছে।"

'কারণটা কী?'

আনিস আনন্দিত গলায় বলল, "গত পরশু দিন যে ইন্টারভিউটা দিয়েছিলাম, সেটার রেজাল্ট বেরিয়েছে আজকে। আমার রেজাল্ট ভালো হয়েছে। সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছি আমি।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। আম্মা, তুমি নিশ্চিত থাকো, এ চাকরিটা আমার হবেই। কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে কোম্পানি থেকে ডাকা হবে।"

প্রাপ্তি

আলেয়া বেগমের চোখে পানি চলে আসল। তিনি এই খবর আনিসের বাবাকে জানালেন। তিনিও খুশি হলেন। সেদিন রাতের খাবারের পর সবাই দই খেল। দুই কেজি দই তিনজনেই এক রাতে খেয়ে শেষ করলেন।

তার এক সপ্তাহ পর ওই কোম্পানি থেকে ডাকা হল আনিসকে। সে খুশি মনে গেলো অফিসে। অফিসের বস (ইমরুল চৌধুরী) তাকে দেখে হাসিমুখে বসতে বললেন। জয়েনিং লেটার আনিসের হাতে দিলেন। আনিস জয়েনিং লেটার পেয়ে খুশি হলো খুব। কিছু সময় চুপচাপ কাটলো। কিছুক্ষণ পর অফিসের বস আনিসের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে নিচু গলায় বললেন, "আপনার কাছে কি পঞ্চাশ হাজার টাকা হবে?"

আনিস অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সে এখনো ঘোরের মধ্যে আছে। তার চাকরি তো কনফার্মড। জয়েনিং লেটারও হাতে পেয়ে গেছে। তাহলে এখন হঠাৎ টাকার প্রসঙ্গ আসছে কোত্থেকে?

ইমরুল সাহেব আবার বললেন, "কী হলো? কথা বলছেন না কেন?"

"স্যার আপনি কী বলতে চাইছেন, সেটা আমি বুঝতে পারছি না।"

"এখানে বুঝতে না পারার কী আছে? আমি তো আর ইংরেজিতে বলি নাই। বাংলায় শুধু একটা প্রশ্ন করেছি।

সহজ-সরল প্রশ্ন। প্রশ্নটা হলো — আপনার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে কি না?"

আনিস মাথা নিচু করে বলল, "জি না স্যার।"

ইমরুল সাহেব ধমকের সুরে বললেন, "টাকা নেই তো আপনার চাকরি করার কোনো দরকার নেই।"

আনিস বলল, "স্যার, আমি তো ভালো রেজাল্ট করে চাকরিটা পেয়েছি। তাহলে আমার চাকরিটা হবে না কেন?"

ইমরুল সাহেব তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, "আজকাল শুধু সার্টিফিকেট দিয়ে কারোর চাকরি হয় না। সার্টিফিকেটের সাথে তার পকেটে টাকাও থাকতে হয়। টাকা ছাড়া দুনিয়া অচল।"

আনিস মন খারাপ করে বেরিয়ে এল। বাসায় ফিরল হেঁটে হেঁটে। বাসায় ফিরতেই আলেয়া বেগম আগ্রহী গলায় বললেন, "বাবা তোর চাকরির কী খবর? চাকরিটা কি হয়েছে?"

আনিস জবাব দিলো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তিনি আবার বললেন, "কী হলো? কথা বলছিস না কেন?"

"আমার চাকরিটা হয়নি মা।"

"কেন হয়নি? তুই না বললি তোর পরীক্ষা ভালো হয়েছে?"

"হ্যাঁ, তা তো হয়েছেই। আমি জয়েনিং লেটারও পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার দ্বারা এই চাকরি করা সম্ভব না।"

"সম্ভব না কেন?"

"আমার অফিসের বস পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুস চেয়েছেন।

বলেছেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে না পারি, তাহলে আমার পদটা 'শূন্য' বলে গণ্য হবে। আমার চাকরিটা আর হবে না।"

আলেয়া বেগম কিছুক্ষণ চুপ থেকে ছেলের মাথায় হাত রেখে বললেন, "চিন্তা করিস না বাবা। সব ঠিক হয়ে যাবে। একটা চাকরি হয়নি তো কী হয়েছে? তুই আবার চাকরির পরীক্ষা দিবি। দেখিস, তুই এ মাসের মধ্যেই এর থেকেও ভালো একটা চাকরি পাবি।"

সেই মাসে আনিসের আর চাকরি হলো না। কিছুদিন আগে বি.সি.এস. প্রিলিম পরীক্ষা দিয়েছে। এবার একটা সম্ভাবনা আছে। বি.সি.এস.-এ 'ঘুসের' কোনো ঝামেলা নেই। আনিস ছাত্র হিসেবেও বেশ ভালো। বিসিএস চাকরিটা হয়ে গেলে একটু স্বস্তি পাবে সে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ পরিষ্কার। কিছুক্ষণ আগেও যে বৃষ্টি পড়ছিল — এখন আকাশের অবস্থা দেখে তা বোঝার উপায় নেই।

আনিস বলল, "দীবা, আজ তাহলে আসি, কেমন? আর হ্যাঁ, আপনার হাতের 'চা'-টা খুব ভালো লেগেছে। আপনার বাবাকে আমার সালাম জানাবেন। উনার সাথে দেখা করে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উনি তো এখনো ঘুমোচ্ছেন। যাই হোক, টেবিলে দুইটা চিরকুট রাখা আছে। একটা আপনাকে লেখা, অন্যটি আপনার বাবাকে। আপনাকে লেখা চিরকুটটা

সময় হলে অবশ্যই পড়বেন।

দীবা জবাব দিল না। সে এখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি আনিসের দিকে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আনিসের মন আবারো খারাপ হলো। তার জন্যে মেয়েটা এভাবে কাঁদছে, এটা তার মোটেই ভালো লাগছে না। তাছাড়া সে নিজেও মেয়েটাকে পছন্দ করে ফেলেছে। এই মেয়ের সাথে বিয়েটা হলে ভালোই হতো। কিন্তু এটা এখন কোনোভাবেই সম্ভব না। অসম্ভব জিনিস নিয়ে স্বপ্ন দেখাটা বোকামি। এটাই তার নিয়তি। নিয়তিকেই মেনে নিতে হবে। কিছু করার নাই।

দীবা এখনো কাঁদছে কি না, সেটা নিশ্চিত হবার জন্য একবার পেছন ফিরে তাকানো দরকার। আনিস তাকালো না। সে বেরিয়ে এল। তার ডান হাতে দীবার দেওয়া সেই রুমালটা। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

রোমাঞ্চ

গভীর গোপন

প্রথম পর্ব, প্রথম অধ্যায়

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

খরস্রোতা বিয়াস নদীর জল কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে। স্বচ্ছ জলরাশির ভিতরে অজস্র ছোটো বড় নুড়ি পাথর দেখা যাচ্ছে। বাইরে হাড় হিম করা ঠান্ডা বাতাস বইছে। নীলোৎপল সুবর্ণরেখাকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দের আতিশয্যে যেই না জলে পা ছুঁইয়েছে, পা'গুলো যেন কেউ কেটে নিয়ে গেল, ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে তারা জল থেকে উঠে পড়ল। বরফশীতল জল ওদের চরণযুগলের যে অংশ স্পর্শ করে গেল, সেই অংশে যন্ত্রনা আরম্ভ হল। তাড়াতাড়ি করে নীলোৎপল হোটেলে ফিরে গিজারের গরম জল দুজনের পায়ে ঢালতে লাগল। খানিক ক্ষণের মধ্যে অবশ্য যন্ত্রনা কমল। ফ্রস্টবাইট হলে আর রক্ষে নেই। ব্রেকফাস্ট ও ধূমায়িত চা খেয়ে ওদের শরীর একটু যেন চাঙ্গা হলো।

নীলোৎপল ও সুবর্ণরেখা অক্টোবরের শীতে মানালি বেড়াতে এসেছে। এবারের পুজো একদম অক্টোবরের শেষে পড়েছে, তাই শীতের তীব্রতা বেশী। আপাতত তারা মানালি ও কুলুর মধ্যবর্তী একটি নির্জন অঞ্চলে বিয়াস নদীর একদম গায়ে একটি হোটেলে উঠেছে – মন ভালো করার

স্বপ্ন নিয়ে, যদিও আসা থেকে সুবর্ণ একদম চুপচাপ ও বিষন্ন। তার একটা কারণ আছে। নীলোৎপলের মনও যে ভালো আছে তা নয়, কিন্তু বাড়িতে একটা দম বন্ধ করা পরিবেশ তাকে অসহ্য করে তুলেছিল। তার থেকেও বড় কথা, সুবর্ণ বাইরে আসার জন্য ভীষণভাবে পীড়াপীড়ি করছিল, নাহলে বাইরে বেড়াতে আসার মত পরিস্থিতি ছিল না। সতীশদার ব্যাপার নিয়ে নীলু ভীষণভাবে চিন্তিত।

নীলোৎপল-সুবর্ণরেখা দুজনেই ব্যাঙ্কে চাকরি করে। দুজনেই অফিসার। পদমর্যাদায় সুবর্ণরেখা একধাপ উঁচু পোস্টে কাজ করে। দুজনে একাকী এই নির্জনে এসেছে মন ভালো করার জন্য। কিন্তু বাইরে বেড়িয়ে মন ভালো করা সত্যিই কি সম্ভব? সম্ভব কিনা জানি না, তবে দু-চারদিন সবকিছু ভুলে প্রকৃতির মধ্যে একাত্ম হয়ে থাকা যায়।

বালিগঞ্জের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে নীলোৎপলের জন্ম। নীলোৎপল এম. বি. এ., অধুনা এক সুবিশাল এপার্টমেন্টে তাদের ১২০০ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট। বাবা রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মা চিত্রশিল্পী, আর্ট কলেজ থেকে চাকরী ছেড়ে এখন হাউসওয়াইফ, যদিও তিনি মাঝেমধ্যে রং তুলি নিয়ে আঁকিবুকি কেটে ছবির মধ্যে জীবন খুঁজে বেড়ান।

সুবর্ণরেখা নিজে সি.এ., বাবা রিটায়ার্ড ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার, মা রিটায়ার্ড অধ্যাপিকা আর সংগীতজ্ঞা। এই দুই ভদ্র কালচার-এর ফ্যামিলিতে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে

রোমাঞ্চ

এমনই এক ইগোইস্টিক সমস্যা নেমে এসেছে, যে আপাতত তার সমাধানের কোন রাস্তাই নেই। কিন্তু মূল সমস্যার শেকড় যে গভীরে সেটা বাড়ির লোক কেন, নীলোৎপল নিজেও বুঝতে পারেনি।

সতীশদা, নীলোৎপলের জ্যাঠতুতো দাদা, পেশায় সাহিত্যিক ও প্রকৃতিপ্রেমী। অদ্ভুত রকমের ভাল ভাল কথা বলতে পারেন। ওনার সঙ্গে কথা বললে, যে কেউই মুগ্ধ না হয়ে পারবে না। কণিকা বলে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম আছে, কিন্তু ওঁদের সেই প্রেম বিয়ের পিঁড়ি পর্যন্ত এখনও পৌঁছয়নি।

অপরাজিতা সুবর্ণরেখার মামাত বোন। এককথায় বেশ সুন্দরী। নৃত্যশিল্পী, নৃত্যের তালে তালে তার শরীরের বিভঙ্গ, যে কোনো পুরুষ মানুষকেই বিস্ময়াবিষ্ট করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার নৃত্যের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। সুবর্ণরেখা নীলোৎপলের সঙ্গে অপরাজিতার পরিচয় করে দেবার সময় মুগ্ধ নীলোৎপল বলে ফেলেছিল, "তোমার সঙ্গে আগে দেখা হলে তোমার সঙ্গেই প্রেম করতাম।" অপরাজিতা চটুল হেসে বলেছিল, "ধ্যাৎ আমার দিদি কোন অংশে খারাপ বলুন দেখি?" তারপর সবাই একসঙ্গে হেসে উঠেছিল।

##

গাড়ির উইণ্ড স্ক্রীন-এর কাঁচটা সুবর্ণরেখা নামিয়ে দিল।

রোমাঞ্চ

দূরে ঐ পাহাড়ী পথে বাঁশের মাচার মধ্যে করে একটি একচালার দুর্গাপ্রতিমা দশ-বারোজন কুলি বয়ে নিয়ে ঢালু পথে সাবধানে এগিয়ে চলেছে। অজান্তে সুবর্ণরেখার হাত কপালে উঠল। আজ দুর্গা ষষ্ঠী, দেবীর বোধন। বাপের বাড়িতে থাকলে হয়ত একটা নতুন সুতির শাড়ি পড়ে পাশের ঠাকুরদালানে গিয়ে পুজো দিত! পাঁচ দিনের মহানন্দ ও ফেলে চলে এসেছে। মার কথা মনে পড়ল। সাদা তাঁতের চওড়া লাল পাড়ের শাড়ি ও কপালে দেওয়া ইয়া একটা বড় সিঁদুরের টিপ পড়ে মাও ঠাকুরদালানে যেতেন। মা গেলেই, পাড়ার সব বয়স্কা মহিলারা মাকে ঘিরে ধরতেন, "দিদি এসেছেন, দিদি এসেছেন" বলে। গান জানেন বলে, মার পাড়ায় খুব ভাল পরিচিতি। সবাই ছুটে এসে বলত, মাসীমা এবারের বিজয়া সম্মিলনীতে আপনাকে কিন্তু অনেকগুলো গান গাইতেই হবে। না, মা কাউকে নিরাশ করেন না। টানা পাঁচ-ছটা ভক্তিমূলক গান গেয়ে সবাইকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করে দিতেন। গান গাওয়া শেষ করে হারমোনিয়ামটা বন্ধ করার সময় মার চোখে থাকত টলটলে জল।

গাড়ি কলুতে পৌঁছাতে পৌঁছাতেই এগারোটা বেজে গেল। গাড়ি থেকে নেমেই ওরা সামনে একটি ছোট পূজা প্যান্ডেল দেখতে পেল। দুজনে এগিয়ে গিয়ে দেবীকে প্রণাম করল। কিছুই ব্যবস্থা নেই, শুধু ঠাকুরটাই এসেছে, পাহাড়ি অঞ্চলের লোকেদের কাছে এত পয়সাকড়ি থাকে না – যে তারা

কলকাতার মতো জাঁকজমক করে পুজো করবে। অত্যন্ত সাদামাটা, আন্তরিকতায় ভরা ছোট্ট পুজো। কলকাতার মতো অত চমক নেই, কিন্তু প্রাণ আছে। খুব ছোট্ট ঠাকুর। প্রতিমার চোখ-মুখ, সাজ-সজ্জা খুব সাধারণ। একেই বুঝি বলে গ্রাম্য পুজো।

##

সতীশদা-সুবর্ণ, অপরাজিতা-নীলোৎপল এই চতুর্ভুজের মধ্যে একটা লুকোচুরি খেলা জমে উঠেছিল। সতীশদা বাড়িতে এলে সুবর্ণ ব্যস্ত আর অপরাজিতা এলে নীলোৎপল। এই বিপরীত মেরুকরণ কেন তাদের জীবনে এল বোঝা গেল না, কিন্তু এটা বোঝা গেল যে সতীশদা-সুবর্ণ, অপরাজিতা-নীলোৎপলের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং সেটা ঠিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক কিনা বলা যায় না। নীলোৎপল-সুবর্ণরেখা দুজনের মধ্যে প্রায়শই অশান্তি লেগে থাকত, বিশেষ করে সতীশদা এলে। সতীশদা এলে সুবর্ণ যেন শশব্যস্ত হয়ে পড়ত। কেউই সেই চতুর্ভুজের বাহু কেটে বেড়িয়ে আসতে পারছিল না। ব্যতিক্রমী ছিল কণিকা। সে এই চক্রব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতেই পারত না। সতীশদার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কতদূর গড়িয়েছে, সেটা ঠিক বোঝা যেত না। সতীশদাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে সে নিস্পৃহ থাকত। আর অপরিজিতা এলে নীলোৎপল তাকে শ্যালিকা মনে করে ঠাট্টা ইয়ার্কি মারত, সেই ঠাট্টা ইয়ার্কির

মধ্যে কোনরকম সীমারেখা থাকত না। নীলোৎপল সাদা মনের ছেলে, জীবনকে জটিল বলে ভাবতে শেখেনি সে। অনেক জটিল কথা ও সমস্যার সে সহজ সমাধান করতে পারত। তারমধ্যে কোন ঢাক গুরগুর ছিল না, তাই অপরাজিতা এলে সে যা তা ইয়ার্কি মারত, আর অপরাজিতা সারা শরীরে হিল্লোল তুলে হাসত আর সেটাই সুবর্ণর চোখে বিষ বলে মনে হয়েছিল। সেবারে যখন অপরাজিতা এসেছিল, নীলোৎপল বলেছিল, “আমার ভাগ্যটাই খারাপ, তোমার মতো যদি একটা আমার বউ হতো, আর সুবর্ণর মতো শ্যালিকা হতো তাহলে খুব ভালো হত,” এই বলেই নীলোৎপল হা হা করে হেসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছিল আর জিতাও সেটা শুনে এনজয় করে বলেছিল, “ধ্যাৎ জামাইবাবু আপনি এমন সব ইয়ার্কি মারেন না, দিদি কোনো দিন না সিরিয়াস ভেবে বসে” – এরপর সেও হেসে উঠেছিল। এদিকে সুবর্ণর মুখ রাগে লাল হয়ে গিয়েছিল, ওর যে এইসব ফস্টামি ভালো লাগছে না। চায়ের কাপটা ফটাস করে রেখে ও বলল, “বসে বসে আড্ডা মারলে চলবে না, আজকে রবিবার, অনেক কাজ আছে, চা-টা খেয়ে আগে বাজার করে আন, আর জিতা তুই আমার সঙ্গে ঐ ঘরে চল, তোর সঙ্গে কথা আছে।”

সুবর্ণরেখা ও নীলোৎপলের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন সুবর্ণর শাশুড়ির নজর এড়িয়ে যেতে পারেনি। সরাসরি মুখে

কিছু না বললেও তিনি তাঁর বেয়ানকে ঠারেঠুরে কথাটা জানিয়ে মেয়েকে সাবধান করে দিতে বলেছিলেন। সুবর্ণ যখন বাপের বাড়িতে গিয়েছিল, তখন তার মা তাকে খুব বকাবকি করেছিলেন। সখেদে বলেছিলেন, "তোর মতো শিক্ষিত-মার্জিত, ভদ্র কালচারড বাড়ির মেয়ে হয়ে এইরকম যে একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়বি, মা হয়ে কোনদিন ভাবতে পারিনি, আর সবচেয়ে বড় কথা হলো নীলোৎপলের মতো একটা ভালো ছেলেকে এইরকমভাবে ঠকানো, বিশেষ করে যখন তোমরা দুজন দুজনকে ভালোবেসে বিয়ে করেছো। মা সুবর্ণকে সতীশবাবুকে এড়িয়ে যেতে ও মেলামেশা করতে বারণ করে দিয়েছিলেন। সেই নিয়ে সুবর্ণর গালভরা রাগ হয়েছিল।

কলু থেকে মনিকরণ গুরুদ্বারাতে পৌঁছে, নীলোৎপলের দেহ মনে এক অদ্ভুত প্রশান্তির সৃষ্টি হল। কাঠের সাঁকোর উপর উঠে নীচে উশৃঙ্খল বিয়াস নদীর উচ্ছলতা দেখতে দেখতে সে আনমনা হয়ে যাচ্ছিল। নদীর বিভিন্ন প্রান্তে উষ্ণ প্রস্রবণের ফুটন্ত জল ও ধোঁয়া চারিদিক আবছা করে দিচ্ছিল। উঁচু রেলিঙে মাথা ঠেকিয়ে সুবর্ণ কেমন যেন আতঙ্কিত মুখে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। নীলু সেটা লক্ষ্য করে এগিয়ে এসে সুবর্ণকে গুরুদ্বারের মধ্যে ঢুকতে বলল। চারিদিকে বিশাল গোলাকার চৌবাচ্চার উষ্ণ জলে সবাই অবগাহন করছে। দুজনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মূল সমাধির কাছে মাথায় রুমাল জড়িয়ে প্রবেশ করল ও

নির্দেশানুযায়ী বসে পড়ল। সেখানে গুরুগম্ভীর স্বরে গ্রন্থিসাহেব পাঠ চলছে আর মৃদু সুরে পাঞ্জাবি মিউজিক বাজছে। অনিচ্ছা সত্বেও দোতলায় নীলোৎপলের উৎসাহে মাটিতে বসে নিরামিষ ভোজন করতে হল, যদিও খাবার অতি উপাদেয়, বিশেষ করে পাঞ্জাবি হালুয়া। খাওয়া-দাওয়া সেরে আরও কিছু দর্শনীয় স্থান দেখে তারা যখন কুলুর শাল ফ্যাক্টরিতে পৌঁছাল, তখন বেলা শেষ। বেছেবুছে বাবা-মায়েদের জন্য শাল কিনে ওরা যখন হোটেলে পৌঁছালো তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

হালকা কিছু খেয়ে আর গরম চা পান করে শরীর একটু যেন চাঙ্গা হল। সুবর্ণর মুখ থমথমে ও আতঙ্কগ্রস্ত। সেটা লক্ষ্য করে নীলোৎপল বলে উঠল, "তোমার কি হয়েছে বলত? আসা থেকে তোমার মুখ গম্ভীর ও কেমন ভয় ভয় ভাব। কি ব্যাপার? অথচ তোমারই জেদাজেদিতে আমি একপ্রকার আসতে বাধ্য হয়েছি। নাহলে এই বিপদের দিনে এখন আমার সতীশদার পাশে থাকা উচিত ছিল, তা না, শুধু তোমার কথায় আমি চলে এলাম। জানিনা সতীশদা এখন কি করছে, দুদিন ধরে টেলিফোনেও পাচ্ছিনা।" সুবর্ণ স্বাভাবিক ভাবে হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। শুধু বলল, "না না, কিছু হয়নি নি তো। একটু টায়ার্ড লাগছে তাই।"

নীলোৎপল বুঝতে পারল যে সুবর্ণ মিথ্যা কথা বলছে। সুবর্ণ হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বিয়াসের জলে পড়ন্ত রোদের

আলোর মধ্যে অস্থির প্রকৃতির তুলি হাতে রঙের আঁকিবুকি খেলা দেখছিল আর ফিরে গিয়েছিল পুরানো সব স্মৃতিতে। নীলোৎপল খুব হাসিখুশি ছেলে, অনেক কঠিন কথাকে সহজ করে বলতে পারে। শ্বশুরমশাই সারাদিন বইয়ের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকেন, নেহাত খাওয়া-দাওয়া আর টুকটাক কাজ করা ছাড়া কোনদিকে তাঁর নজর নেই। শাশুড়ি রান্নাবান্না নিজেই করেন, রান্নার লোক কেটে কুটে ধুয়ে সবকিছু রেডি করে দেয়। শাশুড়ি অসম্ভব সুন্দর রান্না করতে পারেন। সকালবেলা সুবর্ণরেখা কোনরকম সাহায্য করতে পারে না, ফিরে এসেও টায়ার্ড হয়ে যায়, সে নিয়ে শাশুড়ির কোন চাপা অভিমান আছে কিনা সুবর্ণ ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু মাঝেমধ্যে মুখটা কিরকম যেন গম্ভীর করে থাকেন, কিন্তু মন ভালো থাকলে রং তুলি নিয়ে নিজের সৃষ্টিতে ডুবে যান। সেইসময় সুবর্ণ চা নিয়ে যখন বলে, “মা, চ-টা খেয়ে নাও, তখন শাশুড়ি মায়ের চোখমুখ যে খুশিতে ভরে ওঠে সেটা সুবর্ণ ঠিক বুঝতে পারে। তবে কি উনি সুবর্ণর কাছ থেকে ঘরের কাজ চান, না সঙ্গ চান! সুবর্ণর মনে হয়েছিল কাজ নয়, সঙ্গ চান। তাঁর বইমুখো স্বামী তাঁকে সঙ্গ দেন না। জীবন সায়াহ্নে এসে মানুষ ভীষণভাবে সঙ্গ চায়, আর আধুনিক সমাজ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিঃসঙ্গ করে দেয়, আর সেটা শুরু হয় গৃহকোণ থেকেই। তাদের বঞ্চনার ইতিহাস শুরু হয় আপনজনের কাছ থেকেই। কিন্তু সেসব নিয়েও সুবর্ণর সেরকম কোন চিন্তা নেই। ভয় হচ্ছে সতীশদাকে আর নিজেকে

নিয়ে। একে তো একরকম লুকিয়ে চলে আসা, কিন্তু লুকিয়ে, আর সত্য গোপন করে কতদিন সে থাকতে পারবে? সত্যিটা জানাজানি হবেই, আর তখন তার বাঁচার কোন রাস্তা থাকবে না। কিন্তু কি সেই সত্যি!!!

##

হঠাৎ করে অপরাজিতার বিয়েটা হয়ে গেল। বেশ চমকপদ ঘটনা। অনেকটা সিনেমার গল্পের মতো। এটাকেও একটা গল্প বলা যায়। কোন চ্যারিটেবল ট্রাস্টের আয়োজিত বিশাল নৃত্যানুষ্ঠানে কোন সিনেমা প্রযোজকের পুত্র অপরাজিতার রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কোটিপতির এমন সুদর্শন পুত্রকে হাতছাড়া করতে চায়নি অপরাজিতার বাবা-মা, আর অপরাজিতা মনেপ্রাণে চেয়েছিল কোন সুদর্শন ও ধনবান ছেলেকে বিয়ে করতে, তা তার সেই ইচ্ছাপূরণ হলো আর কি। কিন্তু ছেলেটি গুজরাঠি, তা হোক জাতে কি এসে যায়!

মহা ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছিল। কয়েক কোটি টাকা খরচা করা হয়েছিল। কনে বসবার জায়গায় একটা কাঁচের শীষমহল বানানো হয়েছিল। সাতদিন ধরে নীলোৎপলদের নিমন্ত্রণ ছিল। অপরাজিতার বিয়েতে সবচেয়ে খুশি হয়েছিল সুবর্ণরেখা, কারণ সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল আপদ বিদেয় হয়েছে বলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এত আতঙ্কিত কেন নীলোৎপল বুঝতে পারলনা। তবে কি... ...ক্রমশ ■

ভিনগ্রহ থেকে ফিরে

গোবিন্দ মোদক

এলাকাজুড়ে বিরাট চাঞ্চল্য — সবার মুখে একই কথা — চারটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এবং চালকসহ পুরো পুলকার উধাও! স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, চায়ের দোকান, থানা, পার্ক সব জায়গায় একই আলোচনা। বাস্তবিকপক্ষে ঘটনাটি যেমন আশ্চর্যজনক তেমনি অভাবনীয়। প্রতিদিনের মত আজও তারা বাড়ি থেকে যথাসময়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে গাড়িটি স্কুলে পৌঁছায় না এবং আর কেউ তাদের হদিসও দিতে পারে না।

অভিভাবকরা থানায় অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু না এই চারটি শিশু, না গাড়ি, না গাড়ির ড্রাইভার — কাউকেই খুঁজে বের করতে পারেনি। টিভিতে, রেডিওতে একই সংবাদ বারবার পরিবেশিত হচ্ছে। কিন্তু কেউ কোনও খবর দিতে পারছে না। চারিদিকে নানারকম জল্পনা — কি হতে পারে ঘটনাটা! কেউ কেউ বলছে যে ওদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। কেউ বলছে ড্রাইভার ওদেরকে নিয়ে পালিয়ে গেছে দূরে। কেউ বলছে – না, এর পিছনে বড়ো ধরনের শিশু পাচারচক্রের হাত রয়েছে। কেউ আবার আরও বেশি একটু ভেবে বলছে যে – এগুলো পূর্বপরিকল্পিতই ছিল, এবং আজকে সুযোগ পেয়ে সটকান দিয়েছে...

কিন্তু যে যাই বলুক আর যেমনভাবেই বলুক — সমস্যার কোনও সমাধান হলো না। পরদিন খবরের কাগজে বড়ো বড়ো হেডলাইনে ছাপা হলো – "পুলকার সমেত উধাও চারটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু!" এলাকাজুড়ে থমথম করতে লাগল নৈঃশব্দ আর গুজব। ঘটনাটি অনেকদূর গড়ালো। গোয়েন্দা পুলিশ পর্যন্ত এল। কিন্তু কোনও সমাধান হল না। চার-চারটি শিশু এবং ড্রাইভার সমেত পুলকারটি যেন উধাও হয়ে গেছে কর্পূরের মতো।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিনদিন গেল, কিন্তু তাদের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ালো, নানারকম বিভ্রান্তি ছড়ালো, ছড়ালো নানা গুজব। অবশেষে রহস্যের যবনিকা উঠল পাঁচদিন পর – সেদিন বেলা দশটা নাগাদ ঐ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন চারটি শিশু, ড্রাইভার এবং গাড়িটি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ফেরত এলো স্কুলে। তাদের দেখে সবাই অবাক! তবে আশ্চর্যের কথা ঐ চারটি শিশুর শারীরিক কোনও পরিবর্তন না হলেও তাদের মানসিকভাবে বিশাল পরিবর্তন হয়েছে। তারা ভীষণ রকম স্মার্ট হয়েছে এবং এবং তাদের মধ্যে কোনও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না; বরং আর পাঁচটি স্বাভাবিক শিশুর মতো তারা আচরণ করছে, কথা বলছে, ঘুরছে ফিরছে। তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াও নেই। কিন্তু ড্রাইভারটি যেন সম্পূর্ণই বোবা হয়ে গিয়েছে, সে কিছুই বলতে পারল না। সে বড়ো বড়ো চোখ করে আকার-ইঙ্গিতে যা বোঝালো তার বিন্দু-বিসর্গ

অভিভাবকরা বুঝতে পারল না। অবশেষে একজন বুদ্ধি করে তার হাতে কাগজ এবং কলম দিল। তখন ড্রাইভার ছেলেটি ওই কাগজ এবং কলম নিয়ে যে ঘটনাটি লিখল তা যেমন চমকপ্রদ, তেমন বিস্ময়কর এবং অবিশ্বাস্য...

ও লিখল, "প্রতিদিনের মতোই চারটি ছেলেকে নিয়ে কারে তুলে আমি পুলকার চালিয়ে স্কুলের দিকে আসছিলাম। মাঝে মহিষবাথানের যে বিশাল বাগানটি পড়ে সেই বাগানের কাছে আসতেই গাড়ির ইঞ্জিন কিঞ্চিৎ বেগড়বাঁই করতে লাগল। মনে হতে লাগল ইঞ্জিনটি আমার নিয়ন্ত্রণে না থেকে অন্য কারোও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। শক্তিশালী চুম্বক লোহাকে টানলে লোহা যেমন সেই অদৃশ্য টানে চুম্বকের দিকে এগিয়ে যায়, মনে হলো আমার গাড়িটিও তীব্র একটি টানে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি কিছুতেই ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। আমার সবরকম চেষ্টা বিফল করে গাড়িটি প্রবলবেগে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেল। সম্বিৎ ফিরতেই দেখলাম মোচার খোলার মতো স্বচ্ছ কাঁচের মতো একটি পদার্থের মধ্যে আমার গাড়িটি ঢুকে পড়েছে। তারপর সব শুদ্ধু গাড়িটি একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে প্রবলভাবে! একটা কিছু ঘটছে, কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, ঠিক কি হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র গাড়িটি কিসের একটা যেন প্রবল টানে বিশাল সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে তীব্রবেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। তীব্র শব্দে শেষ পর্যন্ত আমি জ্ঞান হারালাম এবং যখন চোখ খুললাম তখন দেখতে পেলাম সম্পূর্ণ অজানা একটি জায়গায়

এসে উপস্থিত হয়েছি। সেখানকার গাছপালা, ভূমির প্রকৃতি, পরিবেশ সব আলাদা, আলোর রঙটাও আলাদা।

সর্বোপরি আমার সামনে অনেকটা মানুষদের মতোই দেখতে যারা এসে দাঁড়াল তারা আর যাই হোক মানুষ নয়। সরু লিকলিকে চেহারা, শরীরের তুলনায় মাথাটি বেশ বড়ো, চারটি করে হাত এবং মাথার উপরে শিংয়ের মতো দু'খানি এন্টেনা। বড়ো বড়ো চোখ দু'টিতে আলো জ্বলছে নিভছে। তাদের হাতে একটি ধাতব দণ্ড থেকে নানা রকমের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তারা এসে মিহি ধাতব সুরে আমাকে অনেক কিছু বলতে লাগল। কিন্তু আমি তার বিন্দুবিসর্গও বুঝলাম না। ওরা আমাকে কথা বলাবার চেষ্টা করতে লাগল, তখন আমি ভীষণভাবে আপত্তি প্রকাশ করলাম এবং বললাম আমাদেরকে কেন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, কি এদের উদ্দেশ্য! কিন্তু আমার কথা ওরা বুঝলো না। তখন একজন মোটা মতো একটি প্রাণী এসে স্টেথোস্কোপ-এর মতো একটি জিনিস আমার বুকে ছোঁয়ালো এবং বিভিন্নভাবে আমাকে বিভিন্ন সাংকেতিক অক্ষর বলতে লাগল। কিন্তু আমি সেগুলো কিছুই বুঝলাম না। অবশেষে সেই প্রাণীটি বলে উঠলো – বাংলা! আমি তখন বললাম – হ্যাঁ, বাংলা। তখন সে বাংলায় কথা বলতে লাগল এবং যা বলল তাতে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। প্রাণীটি বলল – তোমাদেরকে ভেলোসিয়া গ্রহে স্বাগত জানাই।

ভেলোসিয়া গ্রহের নাম শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ঐ প্রাণীটি আবার বলল – ভয় নেই। তোমরা এখন

রয়েছ পৃথিবী থেকে একুশ আলোকবর্ষ দূরে ভেলোসিয়া গ্রহে। চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমরা তোমাদের কোনও অপকার করবো না, বরং তোমাদের উপকার-ই করব। এই যে চারটি ছেলে – তোমরা তাদেরকে প্রতিবন্ধী বলো; আর একটু ভালোবাসা দিয়ে বললে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বলো... হ্যাঁ, প্রতিবন্ধিত্বের বিশেষ লক্ষণ না থাকলেও এরা বুদ্ধিতে কিছুটা জড়ভরত অর্থাৎ কোনও কিছু বুঝতে সময় লাগে এবং সেটিকে বুঝে নিয়ে উত্তর তৈরি করে সেটি ব্যাখ্যা করতে বেশ সময় লাগে। অর্থাৎ তোমাদের ভাষায় এগুলোকে তোমরা হাবা-বোকা বলো।

যাই হোক, এই চারটি শিশু নিয়ে আমরা কিঞ্চিৎ এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই। কেন এরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং কেন এদেরকে ঠিক করা যাবে না। এই নিয়েই আমাদের একটি এক্সপেরিমেন্ট আছে এবং সেই জন্যই তোমাদেরকে আমরা এখানে নিয়ে এসেছি। ভয় নেই আমাদের এক্সপেরিমেন্ট শেষ হলেই তোমাদেরকে আবার যথাস্থানে ফেরত দেব।

ওরা আমাদের ওদের ল্যাবে নিয়ে গেল। সেখানে আমি দেখলাম চারটি শিশুকে চারটি বেডে শুইয়ে রাখা হয়েছে এবং তাদের শরীরের নানা অংশে নানা ধাতব তার এবং স্প্রিং জোড়া রয়েছে, সেগুলির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লাল-নীল আলো জ্বলছে এবং প্রায় আট-দশ জন বৈজ্ঞানিকের মতো চেহারার প্রাণী এদেরকে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত। এসব দেখে

ভয়ে আমি জ্ঞান হারালাম।

ওরা বেশ কয়েকদিন ধরে চারটে ছেলের ওপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল এবং আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন ওরা চারদিন পর ল্যাব থেকে ছেলেগুলোতে বের করলো – তখন দেখলাম ওরা চেহারায় আগের মতোই আছে, ওদের কোনও শারীরিক ক্ষতি নেই এবং ওরা আড়ষ্ট উচ্চারণে বা বোকা বোকা ভঙ্গিতে কোনও উত্তর দেয় না, যা উত্তর দেয় তা সপ্রতিভ। বস্তুতপক্ষে আমি যেন এই চারটি ছেলেকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম এবং দেখলাম ওদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং ওরা যেমন স্মার্ট হয়েছে, তেমনই বুদ্ধিমান হয়ে ফিরেছে। আমি তখন ভিনগ্রহীদেরকে ধন্যবাদ দিলাম এবং বললাম পৃথিবীতে এদেরকে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হোক। তখন ওরা আবার ওদের মধ্যে ইঙ্গিতে কিছু কথা বললো এবং আঙ্গুলের ডগা দিয়ে আমার কপালে স্পর্শ করে আমাকে অজ্ঞান করে দিল।

যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন দেখলাম আমি আমার পুলকারের মধ্যে চালকের আসনে রয়েছি এবং ছেলে চারটি পেছনের সিটগুলিতে ঘুমিয়ে আছে। আমি ওদেরকে জাগালাম। পুরো ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল, কিন্তু এটাই সত্যি। তারপর আমি যথারীতি গাড়ি চালিয়ে আবার ফিরে এলাম এবং মোটামুটি এই হলো ঘটনা।”

চারটি পরিবারের অভিভাবকরা রুদ্ধশ্বাসে এই ঘটনাগুলি এতক্ষণ পড়ছিল। পড়ে তারা শিহরিত হচ্ছিল এবং ভীষণরকম

ভাবে বিস্মিত হচ্ছিল। ঘটনাটি পড়ে তারা কাকে ধন্যবাদ দেবে বুঝতে পারছিল না — তারা কি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে, না কি সেই ভেলোসিয়া নামক গ্রহের অধিবাসীদেরকে ধন্যবাদ দেবে, যারা তাদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর জীবনে নতুন আলোকপাত করেছে! কাদেরকে ধন্যবাদ দেবে তা তারা বুঝতে পারছিল না।

এর মধ্যেই সাংবাদিক চলে এল এবং আশ্চর্যের ব্যাপার সাংবাদিকদের সামনে এসে চারটি শিশুই সপ্রতিভভাবে জানালো যে তারা ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক হতে চায় এবং জিন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে চায়। জিন বিষয়ে তারা যুগান্তকারী এমন একটি গবেষণা করবে যাতে পৃথিবী থেকে এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর জন্মের বিষয়টি নির্মূল হয়ে যাবে অর্থাৎ সব শিশুই সঠিকভাবে জন্মগ্রহণ করবে — আর সেটাই হবে তাদের গবেষণার বিষয়। একথা শুনে সাংবাদিক এবং পুলিশসহ সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। ওদের চারজনের মুখে তখন বিজয়-গর্বের হাসি। ■

শ্রাবণ রাতের অতিথি

দোলা ভট্টাচার্য্য

সেটা ছিল এক শ্রাবণের দিন। গতরাতের অঝোর বর্ষণের শেষে এসেছিল এক রোদেলা সকাল। ভোরবেলায় সূর্যের মুখটা দেখে সকলেই খুব খুশি। ফ্রেশ হয়ে রান্নাঘরে ঢুকেই দেখি, শাশুড়ি মা চায়ের জল বসিয়েছেন। আমাকে দেখেই একগাল হেসে বললেন, "এসো বৌমা! জলখাবারের পাট-টা হাতে হাতে সেরে ফেলি।"

সকালের এই সময়টায় ভীষণ ব্যস্ততা থাকে। জলখাবারের পর্ব শেষ হলেই ভাতের হাঁড়ি বসবে উনুনে। কর্তামশাই, বেরোবেন। ওনার কর্মস্থল বাড়ি থেকে বেশ দূরে। উনি জলখাবার খেয়েই বেরোবেন। দুপুরের খাবার প্যাক করে দিতে হবে। সাড়ে নটার পর একটু নিঃশ্বাস নেবার সময় পাওয়া যায়। সেদিনটা অবশ্য ছিল ছুটির দিন।

ভাসুর সপরিবারে দার্জিলিং গেছেন, পাহাড়ের বর্ষা উপভোগ করতে। বাড়িতে সেদিন আমরা চারজন, কর্তামশাই, আমি, শাশুড়ি মা আর শ্বশুরমশাই। অলস ছন্দে এগিয়ে চলেছে দিন।

বেলা এগারোটা নাগাদ হঠাৎ ল্যান্ডলাইনটা বেজে উঠল। তখন অবশ্য মোবাইলের চল হয়নি। ল্যান্ড ফোনই ভরসা সকলের। কর্তামশাই ধরলেন ফোনটা। রান্নাঘরে কুটনো কাটতে কাটতে শুনতে পেলাম, "সুমি, এদিকে এসো, তোমার ফোন।"

ফোনটা ধরতেই, ওপারে একটা অচেনা কণ্ঠস্বর, "সুমি মা?"

অপেক্ষা

"হ্যাঁ, বলুন...আমি সুমি।"

"আমি তোমার কাকা হই। আমাকে চিনবে না তুমি। তুমি যখন ছ'মাসের বাচ্চা, তখন আমি চাকরি সুত্রে আমেরিকায় আসি। তারপর থেকে আর দেশে ফেরা হয়নি। দু'দিন আগে ইন্ডিয়ায় এসেছি আমি। ফিরছি তোমাদের কাছে। এই মুহুর্তে আমি মুম্বাই এয়ারপোর্টে রয়েছি। দুপুর বারোটায় আমার ফ্লাইট। আশা করছি সন্ধ্যার মধ্যেই পৌঁছে যাব। আজ রাতটা তোমার কাছে কাটিয়ে কাল দাদা বৌদির সাথে দেখা করব।"

এখনও যেন কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি, "কত বড় হয়ে গেছো সুমি! আমার সেই ছোট্ট মেয়েটাকে আজ কতদিন বাদে দেখতে পাব!" আমি যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। এই কাকার কথা অনেক শুনেছি আমি। কিন্তু চোখে তো দেখিনি কখনও। আনন্দর সাথে মিশে রয়েছে তীব্র উৎকন্ঠা। কর্তামশাই সব শুনে বললেন, "তাহলে একটু ভালো কিছু রান্নার ব্যবস্থা করা দরকার। যাই, দেখি কিছু নিয়ে আসি।" একটু পরেই আবার বাবার ফোন এল। ঝাঁপিয়ে পড়লাম, "বাবা শুনেছো, কাকুমণি ফিরছে।"

"হ্যাঁ, রে মা। সেজন্যই তো ফোন করলাম। ও আজ এসে প্রথমে তোর কাছেই উঠবে। তোকে সেই ছোট্টবেলায় দেখেছে। তারপর আর দেখেনি তো। আচ্ছা, শোন মা, তোর কাকুমণি কিন্তু একটু সাবেকি রান্না পছন্দ করে। এতদিন বাদেও ওর খাদ্যরুচি একদম পাল্টায়নি।"

অপেক্ষা

একটু চিন্তায় পড়েছিলাম। আমি তো এ বাড়ির নতুন বৌ। রান্নাও বিশেষ জানি না। তাও আবার সাবেকি রান্না! শাশুড়ি মা বললেন, "তোমায় কোনও চিন্তা করতে হবে না। আমি আছি তো তোমার কাকুমণির কোনো অসুবিধা হবে না।"

সন্ধ্যা উতরে গেল। এখনও কেউ আসেনি। আকাশটা মেঘলা করে আসছে আবার। দরজায় শব্দ হলেই মনে হচ্ছে, ওই বোধহয় এলেন কাকুমণি। রান্নার আয়োজন সারা। আজ অনেকরকম রান্না করা হয়েছে। এখন শুধুই অপেক্ষা। রাত দশটা নাগাদ বাবাকে ফোন করলাম। বাবাও কোনো খবর পাননি। বাধ্য হয়ে আমরাই খেতে বসে গেলাম।

রাত দুটো নাগাদ আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল। বাইরে অসম্ভব ঝড়ের তান্ডব চলছে। সাথে অঝোরে বৃষ্টি। এরই মধ্যে মনে হল কেউ যেন কলিংবেলটা বাজাচ্ছে। খাট থেকে নামতে যেতে কর্তামশাই বাধা দিলেন। আবার বেজে উঠল বেলটা। "আমি দেখছি," বলে কর্তামশাই নামলেন খাট থেকে নামলেন। সেই মুহূর্তেই মাঝের ঘর থেকে শাশুড়ি মায়ের গলা পেলাম, "এত রাতে কে ডাকছে?" শ্বশুরমশাই, শাশুড়ি মা দুজনেই উঠে পড়েছেন। আমরাও বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

শ্বশুরমশাই বললেন, "সুমির কাকামণি এলেন বোধহয়!" কি হোলে চোখ রেখে কারোকে দেখতে পেলেন না কর্তামশাই। তাহলে কলিংবেল বাজায় কে?

কর্তামশাই বললেন, "মনে হচ্ছে ভেতরে জল ঢুকে কোনও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর আগেও একবার এরকম হয়েছিল।"

অপেক্ষা

শ্বশুরমশাই বললেন, “হ্যাঁ। মনে আছে। সেবার হিতেন এসে ঠিক করে দিয়েছিল। কালই আমি যাব হিতেনের বাড়ি। কথাবার্তার মাঝে হঠাৎ আকাশ চিরে ঝলসে উঠল বিদ্যুতের ফলা। আচমকা বজ্রপাতে চমকে উঠলাম সবাই। সেইসঙ্গে কারেন্টটাও চলে গেল। কণ্ঠরোধ হল কলিংবেলের। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম সকলে।

মা বললেন, “ভালোই হয়েছে। যাও, এবার সকলে ঘরে যাও।” মায়ের কথা শেষ হবার আগেই সহসা দরজার কড়া নড়ে উঠল। ভীষণ চমকে উঠলাম। “কে?” কোনো সাড়া নেই।

এবার পাশের বাড়ির বৌদিকে ফোন করে বললাম, “জানলাটা একটু ফাঁক করে দেখো তো, আমাদের দরজায় কে নক্ করছে।” আমাদের দরজার পরেই একফালি সরু রাস্তা। সেই রাস্তার ওপরেই পাশের বাড়ির জানলা।

একটু বাদে বৌদি বলল, “কেউ তো নেই গো। কে নক্ করবে এতরাতে!” আমি বললাম, “এখনও শুনতে পাচ্ছি, সমানে নক্ করে যাচ্ছে। আর তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছো না!” সেই শুনে দড়াম করে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন বৌদি। তার সাড়া রাতে আর সাড়া পেলাম না।

মুহুর্মুহু বজ্রপাতের সাথে দরজায় করাঘাত, সেইসাথে ঝড়ের তান্ডব। মাঝের ঘরে আমরা চারজন, ভয়ে উৎকণ্ঠায় ওষ্ঠাগত প্রাণ। ঈশ্বরের নাম জপে চলেছি শুধু। ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল ঝড়ের মাতন। বৃষ্টির প্রকোপও কমে এল। দরজায় করাঘাত আর শোনা যাচ্ছে না। ফর্সা হয়ে আসছে পুবের আকাশ।

অপেক্ষা

ভোরবেলায় বাইরের দরজা খুলেই চমকে উঠলাম। একি! একটা কুচকুচে কালো বিড়াল নীচের চাতালে মরে পড়ে রয়েছে। আশ্চর্য! একে তো এই তল্লাটে কখনো দেখিনি!

দুপুরের দিকে একটা খবরটা এল। গতকাল মুম্বাই এয়ারপোর্ট থেকে কলকাতাগামী প্লেনে উঠেছিলেন কাকামণি। প্লেন রানওয়ে ছেড়ে আকাশে ওঠার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন উনি। ওনার অবস্থা দেখে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হন পাইলট। মুম্বাই-এর একটা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় কাকামণিকে। অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। কাল রাত একটা নাগাদ সব শেষ। কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কত আশা করেছিলাম কাকুমণির সাথে দেখা হবে। আমাকে কথা দিয়েছিলেন কাকুমণি, আসবেন আমার কাছে। আচ্ছা! তাহলে কি কাল রাতে উনিই এসেছিলেন! কে জানে! ■